‘যারা আলো জ্বেলেছিল’

অধ্যাপক শঙ্কর সোম

মাঝে-মধ্যে মনে হয় এইত সেদিন শান্তিপুর কলেজে এলাম, এর মধ্যে এতগুলি বছর কেটে গেল? তাই হয়তো কথায় বলে ‘সময় চলিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়।’ আবার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে দেখা যাবে, ট্রেন পাঁচ মিনিট লেট থাকলে মনে হয় সময় যেন কাটতেই চায় না। মুমূর্ষু রোগীকে দেখে ডাক্তারবাবু যখন স্বজনদের বলেন, চব্বিশ ঘণ্টা না কাটলে কিছু বলা যাবে না, তখন চব্বিশ ঘণ্টা যেন চব্বিশ বছর হয়ে যায়। অন্যদিকে এতগুলি বছর এই কর্মক্ষেত্রে কেটে গেল, তবু মনে হয় মাত্র সে দিনের কথা। যাদের সঙ্গে জীবন যাত্রা শুরু হয়েছিল, তদের অনেকেই আজ আমাদের মধ্যে নেই। কেউ কেউ অন্যত্র কর্মে নিমগ্ন, অনেকে অবসর জীবন যাপনে ব্যস্ত। আবার কেউ বা কোন সুদূর লোকে বাসিন্দা হয়েছেন, যে লোকের খবর ইহলোকে লোকেরা জানতে পারে না। আজ কলেজের বয়স পঞ্চাশ বছর হল। শুরুর সেই দিনগুলিতে যাঁরা জড়িয়ে ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, আবার চাকুরীসূত্রে পরবর্তী কালে যাঁরা এসেছিলেন, স্বপ্ন দেখেছিলেন, এই কলেজকে নিয়ে কিছু করবার, নূতন কিছু গড়বার, ছড়িয়েদিয়েছিলেন নিজের স্বেদবিন্দু এই মৃত্তিকায়, আজ তাঁরা ‘জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে’ চলে গেছেন।

পরমানন্দবাবুকে খুব স্বল্প সময়ের জন্য আমি সহকর্মী হিসেবে পেয়েছি। বয়সের ভারে ন্যুব্জ, আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যে ক্লিষ্ট। তখন শিক্ষকদের সামাজিক সম্মান হয়তো ছিল, ছিল না আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচবার মতো অর্থ। আজ নানা সংগ্রাম ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের যে আর্থিক স্থায়িত্ব এসেছে, তার সুফল পরমানন্দবাবুর মতো অসংখ্য শিক্ষক পাননি। উল্লেখযোগ্য অবসর ভাতাও ছিল না। দারিদ্র্য ও বার্ধক্য নিয়ে শেষ জীবন কেটেছে। ওনার অসুস্থতার খবরে আমাদের সহকর্মীরা যখন দেখতে গিয়েছেন, উৎফুল্ল মুখে তিনি বলেছেন, ‘এখনো আমায় মনে রেখেছেন আপনারা’। গত বছর ইহলোক ছেড়ে তিনি চলে গেলেন।

আমাদের কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন বলেনবাবু। কৃষ্ণনগরের এক হোটেলের ঘরে শেষ জীবন অবধি তিনি কাটিয়ে গেলেন। একটু পুরাতনপন্থী অথচ নীতিনিষ্ঠ লোক ছিলেন তিনি। ওনার সম্বন্ধে শুনেছি, মাটিতে বিছানা পেতে শুতেন, পিঁপড়েরা বড় বিরক্ত করতো, তাই ব্লিচিং পাউডার দিয়ে লক্ষ্মণের মতো গণ্ডী কেটে নিতেন শয্যার চারিদিকে। মাঝরাতে উঠে টর্চ জ্বেলে দেখলেন পিঁপড়েরা অবলীলাক্রমে তাঁর স্বহস্তরচিত বর্ডার পারাপার করছে। অতঃপর তিনি তখন পুরসভার স্যানিটারি ইন্‌স্পেকটরের জামা টেনে ধরলেন, বললেন ‘তুমি ফাঁকিবাজ! তোমার রাজত্বে ভেজাল জিনিষ চলছে, বসে বসে মাইনে নাও, কাজ কিছু করনা’। প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতেন। ঘরে দেখেছি বেল, নিম প্রভৃতি ভেষজ উপাদান ভর্তি। প্রত্যহ প্রচুর রসুন খেতেন। সংযত জীবনযাত্রা ছিল, পরিমিত আহার ছিল নিয়মিত। মৃত্যুর পর তোষকের নীচে পাওয়া গেল হাজার হাজার টাকা। জীবিত অবস্থায় যাদের দেখা যেত না, সেই সব আত্মীয়রা এসে নিয়েগেল সমস্ত সঞ্চয়।

অসমঞ্জবাবু ছিলেন সক্রিয় রাজনীতির লোক। রাজনৈতিক জগত এমন দ্বন্দ্বময়, এখানে সবাইকে খুশী করা যায়না। মিত্রর সঙ্গে শত্রুও বেড়ে ওঠে আপন নিয়মে। বর্তমানে যুক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার চেয়ে বাহুবলে একেবারে মুক্তি দেওয়াই তো রেওয়াজ। জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন। কলেজের রজত জয়ন্তীতে অসমঞ্জবাবু ছিলেন তাঁর প্রবল উপস্থিতি নিয়ে, স্বমহিমায়। পঞ্চাশ পূর্তিতে রইলেন না। ঘাতকরা ছিনিয়ে না নিয়ে গেলে আজও থাকতেন তিনি আমাদের মধ্যে। কিন্তু হায় !

প্রশান্তবাবুর সৌম্যদর্শন চেহারা আজও যেন চোখের সামনে দেখতেপাই। সর্বদা সাদা পাঞ্জাবী আর ধুতি, শীতকালে সার্জের পাঞ্জাবী। ছাত্রদের বকাঝকা, শাস্তি দিয়ে পড়া আদায় করে নেওয়ার সেই লুপ্তপ্রায় প্রজাতি শিক্ষকদের একজন। জ্ঞানের আকাঙ্খা ছিল অপরিসীম। 'জ্ঞানধারা' প্রকাশে শান্তিপুরের বিদ্বৎসমাজকে দেখিয়েছিলেন জ্ঞানচর্চার এক নূতন দিশা। কলেজের প্রতিছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা। কলেজের নানা সংকটে দায়িত্ব নিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে আসতেন। অন্যায়ের প্রতি ছিলেন প্রতিবাদী, উনি ছিলেন প্রাচীন শান্তিপুরের এক প্রতিনিধি। প্রশান্তবাবুর তিরোধানে কলেজ থেকে এক বিশেষ ঘরানা যেন লুপ্ত হয়েগেল।

সুনীলবরণ বিশ্বাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লোক, শুধুমাত্র এই পরিধি ওনার পরিচয়ের সম্পূর্ণ নয়। সুনীলদা ভালো ফুটবল খেলতেন। ভালো শর্টহ্যাণ্ড জানতেন। সুনীলদা ইংরেজি চর্চায় ছিলেন অগ্রণী। তাঁর অনুবাদ জ্ঞানীগুণী মানুষদের প্রশংসাধন্য। বেশীক্ষণ কোথাও স্থির হয়ে থাকতে পারতেন না। সবসময় কিছু করার একটা বাড়তি উদ্যম ছিল। অবসর কে অপছন্দ করতেন মনেপ্রাণে। তাই বুঝি অবসরের পর দীর্ঘদিন এই পৃথিবীতে রইলেন না।

আমার বিভাগীয় সহকর্মী প্রসূন মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর আকস্মিকতা আমাদের হতবাক করে দিয়েছিল। অসমঞ্জবাবু ছাড়া আর সকলে পরলোকগমন করেছেন অবসরের পর, কিন্তু প্রসূনবাবুর এই মৃত্যু, একে অকালমৃত্যু ছাড়া কিইবা বলা যায়। কলেজের পঞ্চাশ বছর পূর্তির পদযাত্রায় শেষবারের মতো এসেছিলেন কলেজে, সেই যাত্রাই শেষযাত্রা হয়ে গেল। কত পরিকল্পনা করেছিলেন, উৎসবে, আলোয় আলোচনায় ভরিয়ে দেবেন পঞ্চাশের অনুষ্ঠান। শুরুতেই সমাপ্তির বাজনা বেজে গেল। ধূপে, মালায়, মিছিলে শ্মশানে সমাপন সমস্ত উদ্যোগ ও মহতী পরিকল্পনার। চিরদিনের জন্য ফটোর ফ্রেমে আটকে গেলেন। কলেজ হারালো এক উদ্যমী শিক্ষককে, ছাত্ররা হারালো এক বন্ধুপ্রতিম গুরুকে, আমরা হারালাম এক জীবনমুখী রসিক সহকর্মীকে। আমাদের সমগ্র কর্মসূচী বিঘ্নিত হল, কলেজের পঞ্চাশ বছরপূর্তি উৎসবের আলো ম্লান হয়ে গেল।

দিন বয়ে যাবে, মাস থেকে বছরে, পঞ্চাশ বছর হবে পঁচাত্তর, তারপর শতবর্ষ। আমরা থাকবো না, নূতন নূতন মুখ ভরিয়ে দেবে এই প্রাঙ্গণ। শুধু এই প্রাচীন অট্টালিকার প্রতিটি কোণে আমাদের একদা উপস্থিতির রেশ থেকে যাবে। কেউ কেউ হয়তো কোন মুহূর্তে মনে করবে, হয়তো বা করবে না, কারণ কেউ ভোলে কেউ ভোলে না।

"অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।"

— রবীন্দ্রনাথ